দিনে ৬ লাখ টাকার চাঁদা

পক্ষ তিনটি। এক পক্ষ দেয়, দিতে বাধ্য হয়। দুই পক্ষ নেয়, জোর করে। ট্রলার মালিকরা দেয় 'লাইন খরচ' নামে। পুলিশ নেয় 'নিরাপত্তা খরচ' নামে। আর মাস্তানরা নেয় 'ক্ষয়ক্ষতির খরচ' নামে। যে নামেই নেয়া হোক না কেন, মানুষ জানে- এরই নাম চাঁদাবাজি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদের ছবিগুলো সেই চাঁদাবাজিরই খন্ডচিত্র। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বা কম দিলে কী নির্যাতনের শিকার হতে হয় ছবি বহন করছে তার প্রমাণও। শীতলক্ষ্যায় চলছে পুলি আর মাস্তানদের চাঁদাবাজি ....

অনুসন্ধান করেছেন **বদরুদ্দোজা বাবু**, ছবি তুলেছেন **আনোয়ার মজুমদার** ও **এন্ড্রু বিরাজ**

বালুভর্তি ট্রলার

প্রতিদিন লাখের ওপরে আয়। তাও আবার প্রায় বিনিয়োগ ছাড়া। কোনো খরচ নেই, প্রায় পুরোটাই লাভ। আপনি অবাক হলেও, ঘটনাটি সত্যি। এমন ব্যবসা আছে এই দরিদ্র বাংলাদেশে।

পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' সংখ্যাটির কথা। বাংলাদেশে কোটিপতি হবার শর্টকার্ট ফর্মুলা এবং সহজতম পদ্ধতিগুলো জানানো হয়েছিল প্রতিবেদনটিতে। প্রতিবেদনটি সেসময় ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রথম পদ্ধতিটি ছিল 'পেশা যখন রাজনীতি'। রাজনীতিকে সবচেয়ে লাভজনক পেশা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। কোটিপতি হবার নিশ্চিত পন্থা এটি। রাজনীতি করে কোনোভাবে একবার এমপি হতে পারলে আপনার কোটিপতি হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

প্রতিদিন লাখ টাকা আয়ের যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে তা আপনার কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই ব্যবসার প্রথম ও অন্যতম শর্ত আপনাকে রাজনীতিবিদ হতে হবে এবং অবশ্যই সরকারি দলের। দল ক্ষমতায় না থাকলে এমন ব্যবসা করা সম্ভব

১২টি স্পটে চাঁদার হিসাব

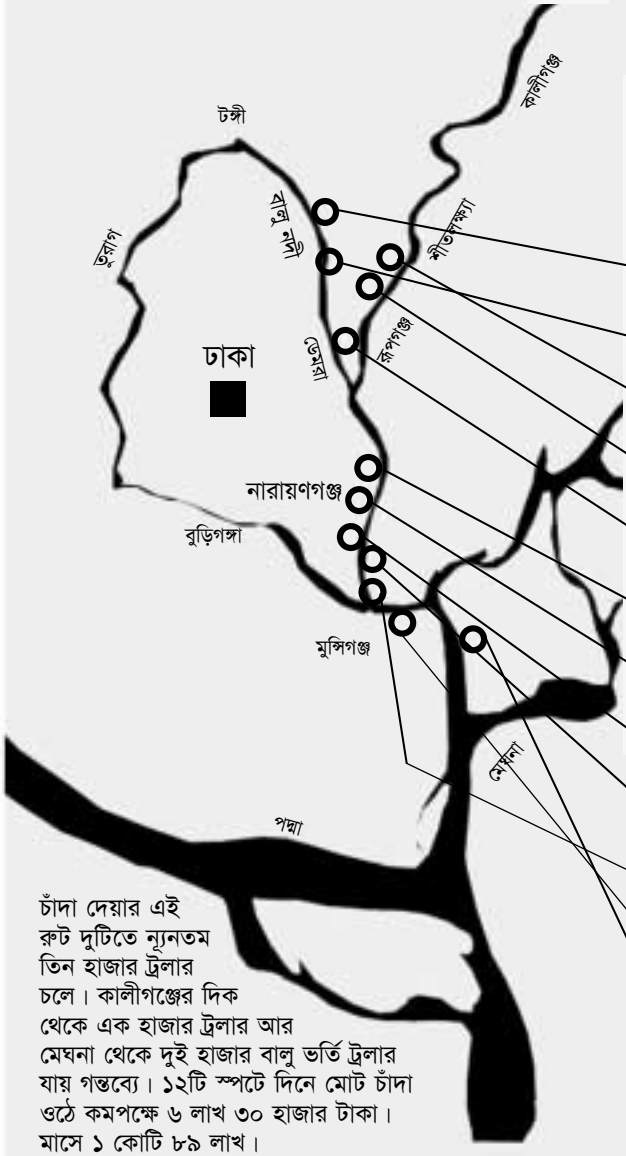

চাঁদা দেয়ার এই রুট দুটিতে ন্যূনতম তিন হাজার ট্রলার চলে। কালীগঞ্জের দিক থেকে এক হাজার ট্রলার আর মেঘনা থেকে দুই হাজার বালু ভর্তি ট্রলার যায় গন্তব্যে। ১২টি স্পটে দিনে মোট চাঁদা ওঠে কমপক্ষে ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। মাসে ১ কোটি ৮৯ লাখ।

১২টি স্পটে দৈনিক চাঁদা

স্পট	ট্রলার প্রতি চাঁদা	মোট চাঁদা	চাঁদাবাজ
কায়েতপাড়া	২০ টাকা	৬০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
পশ্চিমগাঁও	৩০ ”	৯০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
রূপগঞ্জ থানা	২০ ”	২০,০০০	রূপগঞ্জ থানা
মুড়াপাড়া	৩০ ”	৩০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
বালু নদীর ব্রিজ	৫০ ”	১,৫০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
বন্দর ৫নং ঘাট	২০ ”	৪০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
নৌ-ট্রাফিক ফাঁড়ি	২০ ”	৪০,০০০	নৌ-ট্রাফিক পুলিশ
শ্রমিক দল	২০ ”	৪০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
বন্দর থানা	২০ ”	৪০,০০০	বন্দর থানা
কলাগাইচ্ছ্যা ফাঁড়ি	২০ ”	৪০,০০০	কলাগাইচ্ছ্যা পুলিশ
মুন্সিগঞ্জ থানা	২০ ”	৪০,০০০	মুন্সিগঞ্জ থানা
মেঘনা ব্রিজ	২০ ”	৪০,০০০	বিএনপি নেতৃবৃন্দ
মোট টাকা	২৯০ ”	৬,৩০,০০০	

নয়। বাংলাদেশে কোটিপতি হবার শর্টকার্ট ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা আয় করছেন প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকা। তাদের নাম ভাঙিয়ে জনগণের বন্ধু ‘পুলিশ’ও এগিয়ে এসেছে চাঁদার ভাগ নিতে।

লাভজনক এই ব্যবসা হচ্ছে চাঁদাবাজি। পাঠক হয়তো ভাবছেন এ আর নতুন কি? সড়ক থেকে চাঁদাবাজি, জমি থেকে চাঁদাবাজি, প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদাবাজি, এমনকি মানুষ থেকে চাঁদাবাজি- এসবই আমাদের জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। রাজনীতিবিদরা সম্ভবত এসব জায়গা থেকে চাঁদাবাজি করতে করতে ক্লান্ত। তারাও চায় নতুনত্ব। নিত্যনতুন খাত খুলতে চায় যেখান থেকে চাঁদাবাজি করে আয় হবে লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা। এমনই একটি খাত হচ্ছে নৌচাঁদাবাজি। দেশের প্রায় সবগুলো নদীতে চাঁদাবাজি হলেও ইদানীং শীতলক্ষ্যা নদীতে চাঁদাবাজি ছাড়িয়ে গেছে সবকিছুকে। এ নদীতে চলা শুধু বালুর ট্রলার থেকেই প্রতিদিন ৬ লাখ টাকার ওপরে চাঁদাবাজি হয়। তাও আবার রক্ষণশীল হিসেবে।

চান্দা : দিনে ৬ লাখ

ছোট বড় সবগুলো নদীতে চলছে নীরব চাঁদাবাজি। মেঘনা, যমুনা, পদ্মা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা সব নদীতে। দেশের নদীগুলোতে হওয়া চাঁদাবাজির মধ্যে শীতলক্ষ্যার চাঁদাবাজি একটি খন্ডচিত্র মাত্র। সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধান চালিয়েছে এ চাঁদাবাজির ওপর। বের করতে চেয়েছে কোথায় এর উৎস, মূল। খুঁজে বের করেছে এর নেপথ্য নায়কদের।

প্রশ্ন উঠতে পারে শীতলক্ষ্যায় কেন এতো চাঁদাবাজি হচ্ছে? বর্ষা মৌসুমে শীতলক্ষ্যায়

চলে হাজার হাজার বাল্ক হেড বা ট্রলার। শুকিয়ে থাকা ডেমরা থেকে বারিধারা, টঙ্গী যাবার রুটটি বর্ষার পানিতে হয় সচল। বারিধারায় রয়েছে কয়েকটি হাউজিং সাইট। বসুন্ধরা, এরোমেটিক, বনরূপা এই সাইটগুলোতে দিন-রাত বালু ভরাটের কাজ চলে। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা থেকে ট্রলার দিয়ে নিয়ে আসা হয় এই বালু। প্রতিদিন শীতলক্ষ্যার ৬/৭টি স্পটে ড্রেজিং চলে। প্রতিদিন কয়েক লাখ সিএফটি বালু পাওয়া যায় এসব স্পট থেকে। মেঘনা নদীর ব্রিজের নিচে, মুন্সিগঞ্জের ঘাটের দিকেও রয়েছে কয়েকটি ড্রেজিং প্রকল্প। স্পটগুলো থেকে বালুভর্তি ট্রলারগুলো শীতলক্ষ্যার ওপর দিয়ে এসে পৌঁছায় এসব হাউজিং সাইটে।

শীতলক্ষ্যার বুকে প্রতিদিন কত হাজার ট্রলার চলে তার সঠিক পরিসংখ্যান কারো কাছে নেই। ট্রলার মালিকরাও দিতে পারেনি এর সঠিক হিসাব। তবে কেউ বলে তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার। তিন হাজারের কম চলে না এটা নিশ্চিত। প্রতিটি ট্রলারকেই গন্তব্যে যাবার পথে দিতে হয় চাঁদা। ট্রলার মালিকদের ভাষায় এটা 'লাইন খরচ' পুলিশ বলে 'নিরাপত্তা খরচ'। চাঁদাবাজরা বলে 'ক্ষয়ক্ষতির খরচ'। ট্রলার মালিকরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এ খরচের সঙ্গে। বালু বিক্রি করার সময় এ খরচ হিসাব করেই দাম ধরে তারা।

বালুভর্তি ট্রলারকে ১২টি স্পটে চাঁদা দিতে হয়। এ ১২টি স্পটের মধ্যে ১০টি স্পট শীতলক্ষ্যায়, দু'টি মেঘনায়। চাঁদাবাজির এই স্পটগুলোর কাছে বালুভর্তি ট্রলারগুলো প্রধান টার্গেট। ট্রলারগুলোকে কেন্দ্র করেই জমে ওঠে তাদের ব্যবসা। সাইটগুলোতে দু'টি রুট দিয়ে ট্রলারগুলো বালু নিয়ে যায়। একটি হচ্ছে মেঘনা, মুন্সিগঞ্জ থেকে অন্যটি হচ্ছে কাঞ্চন, মুড়াপাড়া, পূর্বগ্রাম। মেঘনা থেকে আসা বালুভর্তি ট্রলারের সংখ্যা দুই হাজারের ওপরে। এই রুটে ১০টি স্পটে চাঁদাবাজি হয়। গন্তব্যে পৌঁছাতে প্রতিটি ট্রলারকে চাঁদা বাবদ খরচ করতে হয় ২৪০ টাকা তাহলে দুই হাজার ট্রলার থেকে মোট চাঁদা ওঠে দিনে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। আর কাঞ্চনপুর থেকে আসা ট্রলারের সংখ্যা এক হাজারের মতো। ৫টি স্পটে চাঁদা বাবদ প্রতিটি ট্রলারের খরচ হয় দেড়শ' টাকা। তাহলে এই রুটে দিনে মোট চাঁদা ওঠে দেড় লাখ টাকা।

এই দুইটি রুটের মোট তিন হাজার ট্রলার থেকে ১২টি স্পটে দিনে চাঁদা ওঠে (৪,৮০,০০০+১,৫০,০০০) ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। প্রতি মাসে মোট চাঁদা ১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। আশ্চর্যজনক তথ্য হচ্ছে, মোট ১২টি স্পটের চাঁদাবাজির মধ্যে ৫টি স্পটে পুলিশ চাঁদাবাজি করে।

রুট-১ : মেঘনা-ডেমরা-টঙ্গী

মেঘনা নদীর ব্রিজের নিচে ড্রেজিং চলছে। এখান থেকে বালু নেয়া ট্রলারের সংখ্যাও প্রচুর। প্রতিনিয়ত বালু উঠছে, ট্রলার ভরছে, ছুটছে গন্তব্যে। ট্রলরটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দলের নামে চাঁদা কালেকশন শুরু হয়। ড্রেজিং-এর ঐ স্পট থেকে নেয়া হয় ২০ টাকা। এরপর ট্রলারটি মুন্সিগঞ্জের কিশোরগঞ্জ ট্যাকে এলে একটি নৌকা থামায় ট্রলারের গতি। নৌকায় বসা লোকটির হাতে তুলে দিতে হয় ২০ টাকা। এই লোকটি কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। তিনি মুন্সিগঞ্জ থানার একজন কনস্টেবল। মুন্সিগঞ্জ থানা পুলিশ বসিয়েছে এ চাঁদার স্পট। যে পুলিশের কাছে ট্রলার মালিকরা তাদের নিরাপত্তা চাইবে তারাও এই চাঁদাবাজির অংশীদার! লাখ টাকার লোভ সামলাতে না পেরে পুলিশ বসিয়েছে এই চাঁদার হাট। এখানেই শেষ নয়। ট্রলারটি ডেমরা ঘাট পর্যন্ত যেতে আরো তিনটি চাঁদাবাজ পুলিশদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা যাক এরা কারা।

কলাগাইছ্যা পর্যন্ত ট্রলারকে আর কোনো লাইন খরচ দিতে হয় না। নারায়ণগঞ্জ বন্দরের একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে এ স্থানে। লাভজনক ব্যবসার সুযোগ পেয়ে তারাও ট্রলারগুলো থেকে চাঁদা নেয়। রেট প্রতি ট্রলারে ২০ টাকা। ফাঁড়ি যদি নিতে পারে, তাহলে বন্দর থানা নেবে না কেন! ট্রলারগুলো কলাগাইছ্যা ছেড়ে মুক্তারপুরের কাছাকাছি এলে বন্দর পুলিশ নেয় তাদের ভাগ। ট্রলার প্রতি ২০ টাকা।

নারায়ণগঞ্জে রয়েছে নৌ-ট্রাফিক পুলিশের অফিস। বন্দরের পাশেই এদের অবস্থান। ফাঁড়িটি নারায়ণগঞ্জ থানার অধীনে। নৌ-যানকে নিরাপত্তা দেওয়াই তাদের কাজ। এই নিরাপত্তার নামে সিমেক্স সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সামনে প্রতি ট্রলার থেকে নৌ-ট্রাফিক পুলিশ নেয় ২০ টাকা। এই ফাঁড়িটির দায়িত্বে রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান। ইতিমধ্যে চাঁদাবাজ পুলিশ হিসেবে বেশ 'সুনাম' কুড়িয়েছেন তিনি। সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সামনে চাঁদাবাজির স্পটটি তার বসানো। নারায়ণগঞ্জ, থানাকে একটি ভাগ দিয়ে বড় অংশটি চলে যায় পকেটে। এ ব্যাপারে এসআই জিয়াউর রহমানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমরা নদীর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করি। আমাদের ফোর্স সারাক্ষণ নদীতে থাকে। প্রতিদিন ট্রলার ভাড়া দিতে হয় সাড়ে তিনশ' টাকা। এরপর জ্বালানি খরচ তো আছেই। এজন্য বালুর ট্রলার থেকে চাঁদা ওঠানো হয়।' এ টাকার মধ্যে কত টাকা তিনি ভাগে পান প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'পুলিশ তো পয়সা খায়। আমি তো বলতে পারবো না আমি ফেরেশতা। এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই।'

ট্রলার মালিকদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শীতলক্ষ্যায় প্রায়শই ডাকাতি, ছিনতাই হয়। ট্রলার দিয়ে এসে ছিনতাই করে নিয়ে যায় বালু, টাকা, জামা কাপড়। মালিকরা জানায়, পুলিশকে চাঁদা না দিলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে বেশি এবং পুলিশের সঙ্গে ছিনতাইকারীদের যোগসাজশ আছে। জিয়াউর রহমানকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

নারায়ণগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান এখনও জানেন না যে শীতলক্ষ্যা নদীতে চাঁদাবাজি হয়। হতে পারে এটাও তিনি বিশ্বাস করতে চান না।

১২টি স্পটে দিনে চাঁদা ওঠে ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। প্রতি মাসে মোট চাঁদা ১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। আশ্চর্যজনক তথ্য হচ্ছে, মোট ১২টি স্পটের চাঁদাবাজির মধ্যে ৫টি স্পটে পুলিশ চাঁদাবাজি করে

চাঁদা অথবা নির্যাতন

পাশের ছবিটি তোলা হয়েছে বালু নদীর ব্রিজের নিচ থেকে। সেখানে প্রতিদিন চাঁদাবাজি হয় এক লাখ টাকার ওপরে। চাঁদা দিতে না পারার 'অপরাধে' এই শ্রমিককে পেটানো হচ্ছে বাঁশ দিয়ে। শত অনুনয়-বিনয় করে মুক্তি পায়নি এ শ্রমিক।

এ ধরনের দৃশ্য প্রতিদিনই দেখা যায় শীতলক্ষ্যা নদীর চাঁদাবাজি স্পটে। নির্দোষ শ্রমিকদের অমানুষিকভাবে পেটানো হয়। কেড়ে নেয়া হয় তাদের জামাকাপড়, সবকিছু। কাশেম এই রুটে চলা একটি ট্রলারের সুকানি। প্রতিদিন কাঞ্চন থেকে বালু ভরে বসুন্ধরা সাইটে ট্রলারে যায়। যাত্রার এ পথে তাকে চাঁদা দিতে হবে এ কথা সে জানে। ১০/১২ দিন আগে বালু নদীর স্পটে ধার্য চাঁদার ২০ টাকা কম দেওয়ায় তাকে পেটানো হয়। সেদিন সে এই স্পটের জন্য ঠিকই ৫০ টাকা রেখেছিল। প্রতিদিন ৪টি স্পটের লাইন খরচের জন্য ট্রলার মালিক ১২০ টাকা তার হাতে ধরিয়ে দেয়। এর পরের দিন কাঞ্চন থেকে বালু ভরে আসার সময় মুড়াপাড়ায় ধরে চাঁদাবাজরা। সেদিনই এই স্পটটি থেকে চাঁদা তোলা শুরু হয়। কাশেমের জানা ছিল না নতুন এই স্পটের কথা। স্বভাবতই প্রতিদিনের লাইন খরচের হিসাবে আরো ৩০ টাকা নেয়া হয়। মুড়াপাড়ায় তাকে দিয়ে আসতে হয় ৩০ টাকা। কাশেমের কাছে ঐ দিন লাইন খরচের ১২০ টাকা ছাড়া অল্প কিছু টাকা ছিল। বালু নদীর ব্রিজের চাঁদার স্পটে ট্রলার এলে কাশেমের কাছে চাওয়া হয় ৫০ টাকা। কাশেম পকেট থেকে ৩০ টাকা বের করে বলে, 'আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই।' চাঁদাবাজদের একজন নৌকায় রাখা বাঁশ নিয়ে উঠে পড়ে ট্রলারে। কাশেম আবারো বলে, 'আমারে চেক কইরা দেখেন কোনো টাকা নাই।' এরপর আর কোনো কথা বলেনি ছেলেটি। বাঁশ দিয়ে পেটাতে থাকে।

ট্রলার শ্রমিকদের কাছে আতঙ্কের নাম বালু নদীর ব্রিজ। পান থেকে চুন খসলেই করা হয় তাদের ওপর নির্যাতন। ডেমরাঘাটে এলেই

অভিযোগ আছে, শেষ পর্যন্ত তার কাছেও চাঁদাবাজির ভাগ গিয়ে পৌঁছায়। তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগের ইয়ত্তা নেই। আপনার মুখ থেকে প্রথম চাঁদাবাজির কথা শুনলাম। আমি তদন্ত করে দেখবো।'

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির আরো একটি স্পট রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ বন্দর ৫নং ঘাটে বালুভর্তি ট্রলার এলে একটি ছোট ট্রলার নৌকা গতিরোধ করে তাদের। ট্রলারে কয়েকজন যুবক। 'নারায়ণগঞ্জ জেলা স্টিলবোট ও বাল্ক হেড মালিক সমিতি'র নামে একটি স্লিপ ধরিয়ে নেয় ২০ টাকা। বাল্ক হেড কিংবা ট্রলারের মালিকরা এ সমিতির কাউকে চেনেন না। তবে তারা বুঝেন সমিতি'র নামে চাঁদা তাদের দিতে হবে। চাঁদাবাজি করার জন্যই এই সমিতির জন্ম। ২০০০-এর পক্ষ থেকে অনুসন্ধান হয় ৫ নং ঘাটে। মালিক সমিতির অফিস খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো হয়। ২১ আগস্ট বুধবার ৫নং ঘাটে গিয়ে মালিক সমিতির নামে চাঁদাবাজির দৃশ্য দেখা গেলেও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের কার্যালয়। চাঁদা নিয়ে তারা যে স্লিপ দেয় সেখানেও নেই কোনো ঠিকানা। স্লিপে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়া আছে দু'টি। ঘাটের দোকানদারদের কাছে এই সমিতির ঠিকানা জানতে চাইলে তারা বলেন, 'এদের কোনো ঠিকানা নেই। নদীর ঐ নৌকা তাদের ঠিকানা।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, এই সমিতির সভাপতি নাজমুল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। এরা দু'জনই বিএনপি'র সমর্থক। এছাড়া সমিতির নেতৃত্বে যারা আছেন তারা সবাই বিএনপি'র সমর্থক। তবে সমিতির কারোরই ট্রলার নেই। শুধু সাধারণ সম্পাদকের ছয় সাতটি ট্রলার রয়েছে। মালিক সমিতির নামে ৫নং ঘাটে এ চাঁদাবাজি নতুন নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এই সমিতির নামে চাঁদা ওঠাতো আওয়ামী লীগের নেতা আগা মিঠু ও শোভা মিয়া। বর্তমান সরকারের সময় এ চাঁদাবাজির নেপথ্যে রয়েছেন দু'জন। এরা সমিতির উপদেষ্টা। নূরুল ইসলাম সরদার তাদের একজন। নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক পদে আছেন তিনি। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ আসনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপি'র প্রার্থী হয়েছেন নরুল ইসলাম সরদার। অন্যজন হচ্ছেন মোমিনুল্লাহ ডেভিড। তিনি

রূপগঞ্জ থানায় কনস্টেবল খায়রুল বাড়িয়ে নিচ্ছেন ২০ টাকা চাঁদা

ট্রলার শ্রমিকরা স্পিড কমিয়ে দেয়। এই স্পটে ওভারটেক করা নিষিদ্ধ। এতো ট্রলার ছোট এই চ্যানেলে চলার সময় প্রায়ই একটির সঙ্গে অন্যটির ধাক্কা লেগে ঢুকে পড়ে বসতবাড়িতে। এর পরের অবস্থাটির বর্ণনা মুখে করা যাবে না। পাশের ছবিটি বলে দিচ্ছে সে কথা। বেল্টের বাড়িতে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা লোকটির মাথা ফেটে গেছে। যে বাড়ির ক্ষতি হয়েছে এরা ঐ বাড়ির কেউ না। চাঁদাবাজদের একজন। বাড়ির ক্ষতি হয়েছে এই অজুহাতে তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে। দিতে না পারায় এই শ্রমিকদের পেটানো হচ্ছে। মাঝে মাঝে ট্রলার পর্যন্ত আটকে রেখে দেয়া হয়। চাহিদা অনুযায়ী টাকা দেওয়ার পরে ট্রলার ছাড়া হয়।

এছাড়াও ভাসমান চাঁদাবাজ রয়েছে বালু নদীর ব্রিজের সামনে। ছোট ছোট নৌকায় এরা মাছ ধরতে থাকে। ট্রলার এলে একশ'-দুইশ' টাকা চায়। দিতে না পারলে জামাকাপড় নিয়ে নেয়। আরেক দল আছে ছিনতাইকারী। বালু কিনতে যাওয়া ট্রলারে উঠে বালু কেনার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পশ্চিমগাঁও, কায়েতপাড়ার দিকে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। তবে এরা কেউ স্থায়ী নয়। মাঝে মাঝে তাদের উৎপাত দেখা যায়।

বালু ছিনতাইয়েরও ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীরা এসে ট্রলারকে অস্ত্রের মুখে নদীর পাড়ে ভিড়ায়। তারপর বালুগুলো ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ১০ আগস্ট, খালেদা জিয়া মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজে আসেন 'মৎস্য পক্ষ' উদ্বোধন করতে। কলেজের মাঠ সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর বালুর। স্থানীয় বিএনপির নেতা ও ক্যাডাররা মিলে শুরু করে বালু ছিনতাই। বালু ভর্তি ট্রলার ধরে নেতারা বলে, 'মন্ত্রীর (বস্ত্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরী) নির্দেশ, বালু দিতে হইবো'। স্বয়ং মন্ত্রীর রেফারেন্সের কাছে একেবারেই অসহায় ট্রলার শ্রমিক!

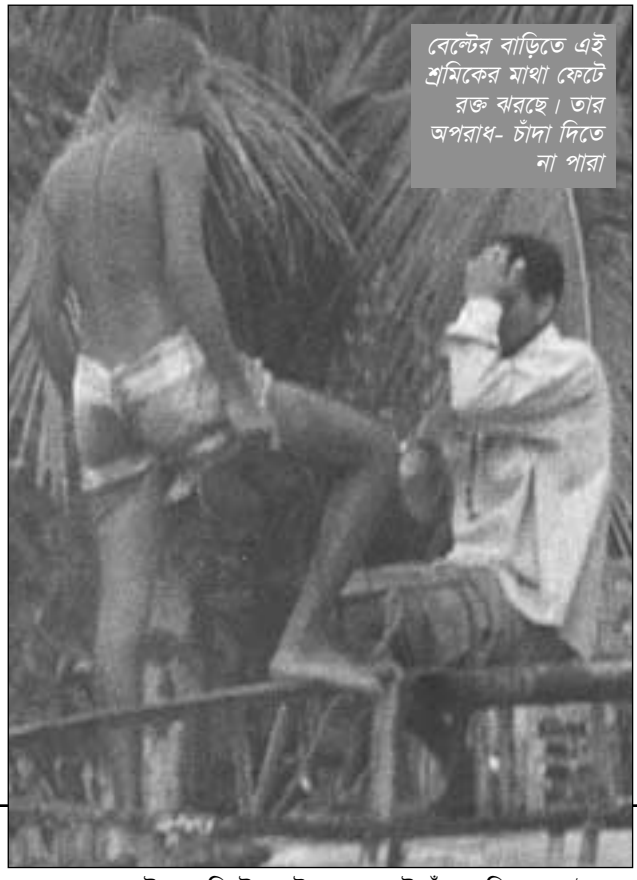

বেল্টের বাড়িতে এই শ্রমিকের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। তার অপরাধ- চাঁদা দিতে না পারা

নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তারা দু'জনেই নারায়ণগঞ্জ শহরে ক্ষমতাশালী। দখলদারিত্বে বিএনপি'র অন্য নেতাদের ছাড়িয়ে গেছেন। নূরুল ইসলাম সরদার যার মাধ্যমে চাঁদাবাজি, দখল করান তার নাম হচ্ছে মামুন। মামুনের রয়েছে বিশাল ক্যাডার বাহিনী। সম্পর্কে তিনি নূরুল ইসলাম সরদারের ভাগ্নে। মোমিনুল্লাহ ডেভিডেরও রয়েছে বিশাল ক্যাডার বাহিনী। তার ছোট ভাই মনা তার হয়ে এসব কাজ করে। মামুন ও মনা দু'জন মিলে ৫নং ঘাটে মালিক সমিতির চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্পটে বালুর ট্রলারগুলোর কাছ থেকে প্রতিদিন চাঁদা ওঠে ৪০ হাজার টাকার মতো। শুধু বালুর ট্রলার নয়, গাছ, কয়লা, পাথরের ট্রলার এই রুট দিয়ে চলাচল করে। তখন হিসাব আর ২০ টাকায় থাকে না। পাঁচশ' থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা নেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য এ হিসাব এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হচ্ছে না।

এই চাঁদার প্রধান অংশটি যায় নূরুল ইসলাম সরদারের কাছে। তার ভাগটি নিয়ে নেয় তার ভাগ্নে মামুন। বাকি ৬৫ ভাগ পায় মোমিনুল্লাহ ডেভিড, সমিতির সভাপতি নাজমুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। এই চাঁদাবাজি সম্পর্কে নূরুল ইসলাম সরদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি মালিক সমিতির কোনো পদে নেই। আমি উপদেষ্টা মাত্র। এই চাঁদাবাজির সঙ্গে আমি জড়িত নই।' মোমিনুল্লাহ ডেভিড তার ও নিজের ভাই মনার সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করে বলেন, 'এখন তো নারায়ণগঞ্জে যা ঘটে সব আমিই করি! নূরুল ইসলামের ভাগ্নে মামুন এ চাঁদাবাজি করে আমি না।' নারায়ণগঞ্জ বন্দর ৫নং ঘাটে চাঁদা দিয়ে বালুর ট্রলার এগিয়ে যায় ডেমরা ঘাটের দিকে। প্রতিদিন মেঘনা থেকে আসা দুই হাজার ট্রলার এই ঘাটে এসে তাদের গতি কমিয়ে দেয়। ডেমরা ঘাটের ডান দিকে শীতলক্ষ্যা চলে গেছে ঘোড়াশালের দিকে। চাঁদাবাজি হয় এই রুটেও।

রুট-২ : কাঞ্চন বাজার-ডেমরা-টঙ্গী

কাঞ্চন বাজার, রূপগঞ্জ থানার সামনে, মুড়াপাড়া, পূর্বগ্রামে ড্রেজিং করে বালু ওঠানো হয়। কাঞ্চনপুর থেকে ট্রলারগুলো ডেমরা পর্যন্ত আসতে দু'টি স্পটে চাঁদা দিতে হয়। একটি হচ্ছে রূপসা স্বাস্থ্য হাসপাতালের সামনে, অন্যটি মুড়াপাড়া ঘাটে। রূপসা স্বাস্থ্য হসপাতালের সামনে রূপগঞ্জ থানা নেয় ২০ টাকা। সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয় এই স্পটে।

১৪ আগস্ট, বুধবার। দুপুর তিনটা। কাঞ্চনপুর বাজার থেকে ছুটে আসছে একটি বালুভর্তি ট্রলার। হাসপাতালের দেয়াল ঘেঁষে একটি ইঞ্জিন নৌকা স্থির। বালুর ট্রলার দেখে মাঝি স্ট্রাট দিলো নৌকার ইঞ্জিন। ট্রলারের কাছাকাছি নৌকা যেতেই একজন শ্রমিক এগিয়ে দিলো ২০ টাকা। কনস্টেবল খায়রুল হাত বাড়িয়ে নিলেন সেই টাকা। কনস্টেবল আমান তার সঙ্গী। দু'জনই রূপগঞ্জ থানার। নৌকা নিয়ে তাদের কাছাকাছি যেতেই উপস্থিতি টের পেয়ে নৌকাটি চলে যায় মাঝ নদীতে।

নারায়ণগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাব, ইন্সপেক্টর পর্যন্ত এ চাঁদার ভাগ পৌঁছে যায়। কনস্টেবলরাও থাকেন চাঁদাবাজের তালিকায়। রূপগঞ্জ থানার ওসি সহ পাঁচজন এসআইয়ের হাতে রয়েছে 'নিষিদ্ধ' মোবাইল ফোন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ইসলামকে এ চাঁদাবাজি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি আকাশ থেকে পড়েন। এমনভাব করেন যেন তিনি জীবনে প্রথম এ ধরনের চাঁদাবাজির কথা শুনেছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'নদীতে চাঁদাবাজি হয়! কই আমি তো জানি না। আমি এই প্রথম শুনলাম। যদি আমার কোনো কনস্টেবল এ কাজ করে থাকে তাহলে আমি ব্যবস্থা নেব।'

রূপগঞ্জ থানার সামনে থেকে একটি বালুভর্তি ট্রলারে উঠলাম। ট্রলারটি মুড়াপাড়া ঘাটের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নৌকা এগিয়ে এলো। ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে গেলেই তারা নৌকা ঘুরিয়ে ফেলে।

‘আমি বলে দিয়েছি, চাঁদা ওঠাও তবে কোনো ঝামেলা যাতে না হয়’

সালাহউদ্দিন, সংসদ সদস্য, ঢাকা-৪

‘হাশেম তো বিএনপির কোনো পোস্টে নেই।... যেহেতু আমার নির্বাচন করেছে তাই আমি তাকে চিনি। এলাকায় গেলে কথা হয়’

২২ আগস্ট, বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় এসব অভিযোগ নিয়ে ২০০০ মুখোমুখি হয় এমপি সালাহউদ্দিনের। দুপুর দুইটার দিকে সালাহউদ্দিনের মোবাইলে ফোন করা হয়। তিনি বলেন, ৭৪ নং দিলকুশা মতিঝিল দৈনিক দেশজনতার অফিসে চলে আসতে। এ পত্রিকাটি এমপি’র। এটা তিনি তার কার্যালয় হিসেবেও ব্যবহার করেন। এমপিকে ফোন করার পরই ফোন করা হয় হাশেমের মোবাইলে। তিনি বলেন, দৈনিক দেশজনতার অফিসে চলে আসতে। দৈনিক দেশজনতার অফিসে ঢুকলেই প্রথমে পড়ে এমপি’র রুম। কয়েকজন দর্শনার্থী বসে আছে দর্শন লাভের আশায়। এমপি সালাহউদ্দিন দুপুরের খাবার খাচ্ছেন। পিয়নের কাছ থেকে জানা গেল, হাশেম পাশের একটি রুমে আছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : শীতলক্ষ্যা নদীর কয়েকটি স্পটে ট্রলার থেকে চাঁদা তোলা হয়। আপনার এলাকা ডেমরার বালু নদীর ব্রিজের নিচ থেকে প্রতিদিন চাঁদা তোলার খবর আমরা পেয়েছি।

সালাহউদ্দিন : চাঁদাবাজি হচ্ছে কি না আমি জানি না। আমার কাছে এ ধরনের খবর এখনও পর্যন্ত আসেনি।

২০০০ : আমরা তিন দিন বিভিন্ন স্পটে ঘুরে দেখেছি সেখানে নিয়মিত চাঁদা তোলা হচ্ছে। বালু নদীর ব্রিজে ট্রলার প্রতি নেয়া হয় ৫০ টাকা চাঁদা।

সালাহউদ্দিন : আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না।

২০০০ : কিছুদিন আগে আপনি ত্রাণ দিতে ত্রিমোহনী গেলে পশ্চিমগাঁও-এর কাছে চাঁদাবাজদের ধাওয়া করেছিলেন। এরা কারা ছিলো?

সালাহউদ্দিন : আমি ত্রাণ দিতে যাবার সময় দেখি পশ্চিমগাঁও-এর দিকে কিছু ছেলে চাঁদাবাজি করছে। তৎক্ষণাৎ আমি ডেমরা থানার পুলিশ নিয়ে ধাওয়া করি তাদের। পরে পুলিশের হাতে তারা ধরা পড়ে। শুনেছি এরা সন্ত্রাসী পাপ্পুর দলবল।

২০০০ : তাহলে তো চাঁদাবাজি হচ্ছে। এবং এরপরই বালু নদীর ব্রিজে চাঁদা তোলার স্পট বসানো হয়...

সালাহউদ্দিন : বিগত সরকারের সময় আমি শুনেছি, লাখ লাখ টাকার টোল তোলা হতো এই স্পটে। কিছুদিন আগে বালু নদীর দুই পাড়ের এলাকার লোকজন মিলে আমার কাছে আসে। তারা নদীর পাড়ের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য কারার জন্য চাঁদা তোলার প্রস্তাব করে আমার কাছে।

২০০০ : আপনি কি তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন?

সালাহউদ্দিন : দুই পাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা আমার কাছে এসেছিলো। চাঁদা ওঠানোর প্রস্তাব দেয়। আমি বলে দিয়েছি, চাঁদা

নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল ইসলাম সরদার

এই চাঁদার প্রধান অংশটি যায় নূরুল ইসলাম সরদারের কাছে। তার ভাগটি নিয়ে নেয় তার ভাগ্নে মামুন। বাকি ৬৫ ভাগ পায় মোমিনুল্লাহ ডেভিড, সমিতির সভাপতি নাজমুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম

৫ নং ঘাটে মালিক সমিতির নামে আদায় হচ্ছে ট্রলার প্রতি ২০ টাকা

এই স্পট থেকে প্রতি ট্রলার থেকে ৩০ টাকা করে নেয়া হয়। বিনিময়ে একটি রসিদ দেয়া হয়। তাতে লেখা ‘রূপগঞ্জ বাল্ক হেড মালিক ও শ্রমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি’। এ সমিতির অস্তিত্বের কথা ট্রলার মালিকরা বলতে পারেন না। রূপগঞ্জ থানার ট্রলার

ওঠাও তবে কোনো ঝামেলা যাতে না হয়। পরে শুনেছি, কায়েতপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দুই পক্ষের এলাকাবাসীর মধ্যে বোঝাপড়া করে দেয়।

২০০০ : বালু নদীর ব্রিজের স্পটে গিয়ে আমরা দেখেছি, যারা চাঁদাবাজি করছে তারা সবাই ডেমরা ইউনিয়নের বিএনপি'র কর্মী ক্যাডার হিসেবে পরিচিত।

সালাহউদ্দিন : বিএনপির এরা কেউ নয়। আর এ পর্যন্ত আমাকে কেউ এ বিষয়ে ইনফর্ম করেনি।

২০০০ : এ স্পটের চাঁদাবাজি যে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম হাশেম। তিনি কি বিএনপির একজন নন?

সালাহউদ্দিন : হাশেম তো বিএনপির কোনো পোস্টে নেই।

২০০০ : তাকে আপনি চেনেন কীভাবে?

সালাহউদ্দিন : ও আমার নির্বাচন করেছে।

২০০০ : এলাকায় হাশেম বলে বেড়ায়, সংসদ নির্বাচনে সে আপনাকে জিতিয়ে আনার জন্য ৩০/৪০ লাখ টাকা খরচ করেছে– এ কথা কতটুকু সত্যি?

সালাহউদ্দিন : হাশেম এতো টাকা পাবে কোথায়। ওতো ছোটখাটো ব্যবসা করে।

২০০০ : ডেমরাঘাট, বাজার, স্ট্যান্ড, পুকুর, খামার– এ সবই হাশেমের দখলে...

সালাহউদ্দিন : এগুলো তো ইজারার মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। হাশেম ইজারার ডাকের মাধ্যমে এগুলো পেয়েছে।

২০০০ : এসব ডাক পেতে হলে ক্ষমতা লাগে। হাশেম তো বিএনপির কোনো পোস্টে নেই। তার এতো ক্ষমতার উৎস কোথায়?

সালাহউদ্দিন : আমি কীভাবে বলবো! সঠিক পদ্ধতিতে সে ডাক পেয়েছে।

২০০০ : আপনার সঙ্গে হাশেমের সম্পর্ক কেমন?

সালাহউদ্দিন : যেহেতু আমার নির্বাচন করেছে তাই আমি তাকে চিনি। এলাকায় গেলে কথা হয়।

২০০০ : বালু নদীর স্পটে চাঁদা ওঠে প্রতিদিন এক লাখের ওপরে। অভিযোগ আছে, অল্প কিছু খরচ বাদ দিয়ে হাশেম এই টাকাটা নিয়ে আসে। সে একটি অংশ রেখে বাকি অংশটি ডেমরা শাখার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করে।

সালাহউদ্দিন : আপনি সম্পূর্ণ ভুল শুনেছেন। আমি এর মধ্যে জড়িত না। অভিযোগগুলো ঠিক না। আমার নাম ভাঙিয়ে হয়তো কেউ চাঁদা তোলে।

২০০০ : তাহলে আমরা কি আশা করতে পারি আপনি ডেমরার এমপি হিসেবে এই চাঁদাবাজি বন্ধ করবেন?

সালাহউদ্দিন : অবশ্যই। আমি এই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

সালাহউদ্দিনের রুম থেকে বের হয়ে হাশেমের সঙ্গে কথা বলবো এমন চিন্তা-ভাবনা ছিলো। রুম থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সালাহউদ্দিন ডেকে পাঠান পিয়নকে। ফোন করি হাশেমের মোবাইলে। ওপাশ থেকে হাশেম জানান, তিনি এখন মালিবাগে। এদিকে সালাহউদ্দিনের রুম থেকে পিয়ন বের হয়ে দৈনিক দেশজনতার চারপাশে খুঁজতে থাকে হাশেমকে।

'অবশ্যই। আমি এই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব'

মালিকরা ২০০০কে বলেন, '২০-২৫ দিন আগে মুড়াপাড়া ইউনিয়নের বিএনপি নেতারা মালিক সমিতির নামে এই চাঁদা ওঠানো শুরু করে। এই সমিতি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।'

কাঞ্চনপুর থেকে আসা ট্রলারগুলোকে এই দুই স্পটে মোট ৫০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। তারপরেই সম্ভব ডেমরা ঘাটের দিকে যাওয়া।

এই দু'টি রুটে প্রতিদিন তিন হাজারের ওপরে ট্রলার এসে উপস্থিত হয় ডেমরা ঘাটে। ডেমরা ঘাট থেকে সোজা ডেমরা-চনপাড়া সেতুর নিচ দিয়ে শীতলক্ষ্যার একটি শাখা বালু নদী চলে গেছে টঙ্গীর দিকে। ডেমরা-চনপাড়া সেতুটি স্থানীয়দের কাছে পরিচিত বালুনদীর ব্রিজ নামে। এই ব্রিজের নিচেই একটি চাঁদার স্পট। বালু নদীর ব্রিজের সামনে এগিয়ে গেলে পশ্চিম গাঁও ও কয়েদপাড়া এলাকার বিএনপি নেতারা নেয় ৩০ ও ২০ টাকা।

১২টি চাঁদার স্পটের মধ্যে কোথাও ২০ টাকা, ৩০ টাকা নেয়া হলেও এই স্পটে নেয়া হয় ৫০ টাকা। ৫০ টাকার এক টাকাও কম দিলে ট্রলার শ্রমিকদের নির্যাতন করতে ছাড়ে না চাঁদাবাজরা। কখনো বাঁশ দিয়ে কখনো চাবুক দিয়ে নীরিহ শ্রমিকদের। দুই রুটের ট্রলারগুলোকে এই স্পটের উপর দিয়ে যেতে হয়। তাই চাঁদার কালেকশনও হয় সবচেয়ে বেশি। তিন হাজার ট্রলারের কাছ থেকে এ স্পটে দিনে চাঁদা ওঠে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ২০০০-এর পক্ষ থেকে তিনদিন অনুসন্ধান চালানো হয় এই স্পটে। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে নেপথ্যের ব্যক্তিরা, তাদের পরিচয়। তাদের ক্ষমতা। ক্ষমতার উৎস।

ডেট লাইন বালু নদীর ব্রিজ : চাঁদাবাজি দৈনিক লাখের ওপরে

১৪ আগস্ট, বুধবার। সকাল ৯.৩০ মিনিট। বালু নদীর ব্রিজের পাশে রিকশাওয়ালা সোহরাব নামিয়ে দিয়ে বললো, 'ব্রিজের উপরে উইঠ্যা ডেমরা ঘাটের দিকে তাকাইলে আপনি যা খুঁজতাছেন পাইয়া যাইবেন।' সোহরাবের কথামতো বালু নদীর ব্রিজের উপরে উঠলাম। ডেমরা ঘাটের দিকে তাকাতেই চোখ পড়লো ট্রলারগুলোর দিকে। লাইন ধরে বাল্ক হেডগুলো ব্রিজের নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ট্রলারের বিশাল লাইন। খুব আস্তে আস্তে চলছে। একটার পেছনে আরেকটা প্রায় লেগে যাচ্ছে। ব্রিজের এক কোণায় এলাম। চনপাড়ার দিকে একটি নৌকায় কয়েকজন। প্রতিটি ট্রলারের কাছে তারা যাচ্ছে। ফটোগ্রাফারের এক হাজার মিলিমিটার টেলিলেন্সে ধরা পড়লো তাদের টাকা নেয়ার দৃশ্য। তারা ট্রলারের কাছাকাছি যেতেই ট্রলার শ্রমিক ৫০ টাকা বের করে দেয়।

১১ টার দিকে ট্রলারের ভীড় বাড়তে থাকে। ডেমরা ঘাট, বালু নদীর ব্রিজ জুড়ে শুধু ট্রলার আর ট্রলার। হিমশিম খেয়ে যায় চাঁদাবাজরা। নৌকায় করে সবগুলো ট্রলার থেকে চাঁদা নেয়া সম্ভব হয় না। নদীতে নেমে পড়ে দু'জন। সাঁতার দিয়ে এক ট্রলার থেকে আরেক ট্রলারে গিয়ে ৫০ টাকা নিয়ে আসছে। নৌকায় নেতা গোছের একজন বসে আছে। তার মাথায় ছাতি ধরা।

ব্রিজের ওপর থেকে ছবি তোলার সময় একজন গ্রামবাসী এগিয়ে আসলো। 'এইখানে বেশিক্ষণ থাইকেন না। ওরা আপনাগোর দেইখা ফালাইছে। তাড়াতাড়ি চইলা যান'- বলে চনপাড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কারা এই কাজ করে, কেন করছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'গ্রামের সবাই জানে। প্রভাবশালীরা, ক্ষমতাশালীরা করছে। গ্রামের

কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।' এই ব্যক্তির মতো আরো কয়েকজনের কাছে জানতে চাইলাম। সবাই ব্যাপারটি এড়িয়ে গেল। গ্রামবাসী এদের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। কারণ এরা সবাই ক্ষমতাশালী লোক। এমন কিছু নেই এরা পারে না। পুলিশ, প্রশাসন সবই এদের নাগালের মধ্যে। তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেবার কিংবা প্রতিবাদ জানানোর সাহস গ্রামবাসীর কারোই নেই। তারা শুধু দর্শক।

১৬ আগস্ট, শুক্রবার নেপথ্যকারীদের খোঁজে পৌঁছাই ডেমরা ঘাটে। ডেমরা বাজার, ঘাট, বসবাসকারী এমনকি ওপারের চনপাড়ার গ্রামবাসীদের অনেকের সঙ্গে কথা বলা হয়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। শীতলক্ষ্যার দু'পাড়ের গ্রামবাসী জানে, জানানো হয়েছে উন্নয়নের নামে এ চাঁদাবাজি। নদীর পানি বৃদ্ধি এবং ট্রলারের যাতায়াতে দুই পাড়ে ঘর-বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে নদীর স্রোতে। ছোট চ্যানেল দিয়ে এতো ট্রলার চলাচলের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়ি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য চাঁদাবাজি। অবশ্য গ্রামবাসী এও জানে চাঁদার টাকার ভাগ তারা কখনও পাবে না। এবং যথারীতি পাচ্ছেও না।

উন্নয়ন কমিটির নামে এ চাঁদা তোলা হচ্ছে প্রতিদিন। সহজেই প্রশ্ন আসে উন্নয়ন কমিটিতে কারা আছে? শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে ডেমরা ঘাট থেকে একটি নৌকা ভাড়া করে যেতে বললাম চাঁদাবাজদের কাছে। কাছাকাছি যেতে তারা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে চলে যায় ডেমরা বাজারের দিকে। পিছু নিলাম তাদের। ঘাটে এসে নৌকায় বসা চাঁদাবাজ নূরু ও হালিম। কথা বলতে চাইলে তারা প্রথমেই জানতে চাইলো কি নিয়ে আমরা রিপোর্ট করছি। 'আপনারা নাকি ট্রলার থেকে চাঁদা নিয়ে পাড় ভাঙা মানুষকে দিচ্ছেন, এই বিষয়ের ওপর রিপোর্ট করতে এসেছি'- বলে তাদের শান্ত করলাম। এদিকে নদীতে এখন আর চাঁদা নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু এই সময় ট্রলারের রাশ থাকে। ঝাকে ঝাকে ট্রলার আসতে থাকে। নূরু ব্যাপারটি বুঝতে পেরে হালিমকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। 'ওনাদের অফিসে নিয়ে বসা। আর নদীর পাড় যে ভেঙে গিয়েছে তা দেখা' হালিমকে নির্দেশ দিয়ে নূরু নৌকা নিয়ে চাঁদা কালেকশনে চলে গেলেন। হালিম আমাদের নিয়ে এলো দেলোয়ারের তেলের দোকানে। এই দোকান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় চাঁদাবাজি।

উন্নয়ন কমিটিতে কারা আছে, টাকা কী ভাবে খরচ হয়- কিছুই বললো না দেলোয়ার। শুধু বললো, 'আমি ভালোমতো জানি না। তবে যারা আছে তাদের কেউ নেই। একটু অপেক্ষা করেন এসে পড়বে।' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কারো দেখা পাওয়া গেল না। হালিম আমাদের নিয়ে বের হয় নদীর পাড় ভাঙার দৃশ্য দেখাতে। ঐ

প্রতিদিন বালু নদীর ব্রিজের নিচ দিয়ে তিন হাজার ট্রলার গন্তব্যে যায়

উন্নয়ন কমিটির কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলে, 'আমরা জানি না', শেষ পর্যন্ত নূরু বললেন, 'অনেক তো দৌড়াদৌড়ি করলেন এবার ঢাকা চলে যান। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করমু'

চাঁদাবাজ নূরু

দিকে নূরু চাঁদা নিয়ে চলছে। পাড় ভাঙা, বসতবাড়ি ক্ষয়ক্ষতির নমুনা হালিম ঠিকই দেখাতে পারলো কিন্তু দেখাতে পারেনি দু'পাড়ে তাদের ইট কিংবা বালু ফেলা। নদীর দু' পাড়েই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। পানি কারো কারো ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বালুভর্তি ট্রলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসব বসতবাড়ির ওপর উঠিয়ে দেয়। নদীর পাড়ে বাড়ি একজন বললেন, 'এই রুট দিয়ে ট্রলার চললে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আমরা হই। ট্রলার যাবার পর নদীর স্রোতে পাড় ভেঙে যায়। আমাদের নাম করে যে চাঁদা দেয়া হয় তার ভাগ আমরা পাই না। এমনকি পাড়ে ইট পর্যন্ত ফেলা হয় না।'

এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা বলেই বালু নদীর ব্রিজের নিচে চাঁদাবাজি হচ্ছে। অথচ এখন পর্যন্ত এই টাকা ভাগ তারা পায়নি। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া গেছে এর সত্যতা। গত সরকারের সময়েও এই স্পটে চাঁদাবাজি হয়েছিল। তখন ডেমরার আওয়ামী লীগের এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তোতা, বাশার, ইস্রাফিল চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের চাঁদাবাজির রেট ছিল ট্রলার প্রতি ২০ টাকা। এই টাকার ভাগ চলে যেত হাবিবুর রহমান মোল্লার পকেটে। সরকার পাল্টেছে, সেই সঙ্গে পাল্টে গেছে দৃশ্যপট।

চনপাড়ার কাছাকাছি যেতেই নূরু চাঁদা তোলা বন্ধ করে দিলো। আমাদেরকে এই স্পটে নিয়ে আসার জন্য হালিমকে জোরে ধমক দিয়ে নূরু বললো, 'হারামজাদা তোরে না কইছি অফিসে বসাইতে। এইখানে লইয়া আসছস কেন?' নূরু আমাদের আবার দেলোয়ারের তেলের দোকানে নিয়ে আসলো। দেলেয়ার ব্যস্ত হয়ে গেল আমাদের আপ্যায়ন করাতে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই এড়িয়ে যায় দু'জন। উন্নয়ন কমিটির কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলে, 'আমরা জানি না', শেষ পর্যন্ত নূরু বললেন, 'অনেক তো দৌড়াদৌড়ি করলেন এবার ঢাকা চলে যান। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করমু।' দেলোয়ার মুঠি বন্ধ করে একটি হাত এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এতো কষ্ট করে আসছেন খরচপাতিটা রাখেন। বেশি না যাওয়া আসার পয়সা।' টাকা না নেয়াতে দেলোয়ার, নূরুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটলাম সোর্সের খোঁজে।

২৪ ঘন্টায় আয় লাখ টাকা : নেপথ্যে এমপি সালাউদ্দিন

বালু নদীর ব্রিজে ২৪ ঘন্টাই চাঁদাবাজি চলে। দিন রাত সব সময় ট্রলারগুলো বালু নিয়ে যায় সাইটগুলোতে। প্রায় তিন হাজার ট্রলারের থেকে (প্রতিটি থেকে ৫০ টাকা করে) দিনে আয় ন্যূনতম এক লাখ ৫০ হাজার টাকা। মাসে ৪৫ লাখ টাকা।

আন্ডারওয়ার্ল্ড ব্যবসা

ড্রেজিং

প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা আয়! ব্যবসাটা মন্দ না। কিন্তু এ ব্যবসা করার জন্য চাই ক্ষমতা, রাজনৈতিক সমর্থন

শীতলক্ষ্যা, মেঘনায় ড্রেজিং চলছে। প্রতিদিন উঠছে লাখ লাখ সিএফটি বালু। এই বালু কারা উঠাচ্ছে? বিআইডব্লিউটিএ, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এমনকি খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় এই কাজের দায়িত্বে নেই। নদীর বুক জুড়ে ড্রেজিং করছে স্থানীয় বিএনপি নেতারা। ব্যবসাটি আন্ডারওয়ার্ল্ড বিজনেস নামে পরিচিত।

সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধান চালায় এই আন্ডারওয়ার্ল্ড বিজনেসের স্বরূপ উদ্ধারে।

রূপগঞ্জ থানার রূপসী পূর্বগ্রাম। কয়েক মাস আগে এই গ্রামের পক্ষ থেকে নেয়া হয় একটি ড্রেজিং প্রকল্প। পূর্বগ্রামের সামনের চরে বসানো হয় ১৫-২০টি ড্রেজিং মেশিন। এই ড্রেজিং মেশিন দিয়ে ওঠানো হয় প্রতিদিন প্রায় ২ লাখ সিএফটি বালু। প্রতি সিএফটি বালু বিক্রি হয় ৫০ পয়সায়। তাহলে দুই লাখ সিএফটি বালুর জন্য পূর্বগ্রাম ড্রেজিং প্রকল্প আয় করে এক লাখ টাকা। এবার আসা যাক খরচের প্রসঙ্গে। ড্রেজিং ট্রলার মালিক তাদের বালু ওঠানোর খরচ হিসেবে নেয় শতকরা ৫০ ভাগ। তাদের এ আয়ের মধ্যে তেল খরচ, শ্রমিক খরচ আছে। বাকি ৫০ হাজার টাকা পায় ড্রেজিং প্রকল্পের উদ্যোক্তরা।

প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা আয়! ব্যবসাটা মন্দ না। কিন্তু এ ব্যবসা করার জন্য চাই ক্ষমতা, রাজনৈতিক সমর্থন। অবশ্যই তা হবে সরকারি দলের। এবার আসা যাক পূর্বগ্রাম ড্রেজিং প্রকল্পে কারা আছে। নদীর পাড় ভেঙে জেগে উঠছে বালুর চর। পূর্বগ্রামবাসীর মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাদের বসতবাড়ি পুরোটাই গিলে নিয়েছে শীতলক্ষ্যা। চর জেগে উঠলেই এসব মানুষ তাদের জমি ফেরত পায়। এসব মানুষের কথা ভেবেই নদীর পানিতে ডুবে থাকা বালুর চর ড্রেজিং করার অনুমতি দেয় খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। ব্যক্তিগতভাবেও ড্রেজিং করার অনুমতি পাওয়া যায়। খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ড্রেজিং করার অনুমতি চাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও এমপির সম্মতি লাগে। তাদের সম্মতি পেলে খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বছরে ৪০ হাজার টাকার চুক্তিতে ৩০ একর এলাকা জুড়ে ড্রেজিং করার অনুমতি দেয়। আয় হিসাবে এই মূল্য একেবারেই নামমাত্র। পূর্বগ্রাম ড্রেজিং প্রকল্পে প্রতিদিনই আয় হয় ৩০ হাজারের ওপরে।

পূর্বগ্রাম ড্রেজিং প্রকল্পের এই আয় তাহলে কে পায়? নদীর পাড়ের

এই বিপুল অর্থের ভোগকারী কারা? এলাকাবাসী জানে উন্নয়ন কমিটির কথা। চাঁদাবাজরা স্বীকার করে উন্নয়ন কমিটি অস্তিত্বের। তারা বলে, এলাকার মুরব্বিরা রয়েছেন পরিচালনা করেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তিনটি শিফটে ৫ জন করে মোট ১৫ জন নৌকায় থেকে চাঁদাবাজি করে। জানা যায়, সালে আহম্মদ সব সময় নৌকায় থাকে। চাঁদা ঠিক মতো কালেকশন হচ্ছে কি না এসবই দেখা তার দায়িত্ব। নূরুও তদারকির দায়িত্বে রয়েছে। এছাড়া শাহজাহান, মাহবুব, শাহাবুদ্দীন, আলী মিয়া, বারেক, গুল মোহাম্মদ(গোলা), রবিউল প্রতিদিন বিভিন্ন সিফটে চাঁদাবাজি করে। ক্যাডার আছে কয়েকজন। আবদুল্লাহ, শামীম, হালিম, ইব্রাহিম, উজ্জ্বল, ফজলু, নূরু ইসলাম- এরা নৌকায় থাকে সব সময়। ট্রলারের কাছ থেকে এরা চাঁদাটা নিয়ে সালে আহম্মদকে দেয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এরা প্রত্যেকে প্রতিদিন দেড়শ' টাকা পায়। সালে আহম্মদও এখানে কিছুই না। সেও নির্দিষ্ট টাকা পায়। সালে আহম্মদ প্রতিদিনের কালেকশন নিয়ে জমা দেয় তেলের দোকানদার দেলোয়ারের কাছে। দেলোয়ারের কাছ থেকে সন্ধ্যায় এই টাকা সংগ্রহ করে আবুল হাশেম। পুরো টাকা নিয়ে যায় আবুল হাশেম। অনুসন্ধানে জানা যায়, আবুল হাশেম ৪০ ভাগ নিজের কাছে রেখে বাকি ৬০ ভাগ নিয়ে জমা করেন ডেমরা কৃষি ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে। অ্যাকাউন্টটি বর্তমান এমপি সালাউদ্দিনের। কে এই আবুল হাশেম?

জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য আবুল হাশেম । কোনো পদে না থাকলেও তিনিই এখন ডেমরার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী ব্যক্তি। গত সরকারের সময় ডেমরা ঘাটে একটি বালুর ব্যবসা ছিল। আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গেও ছিল সুসম্পর্ক। বিএনপি'র সঙ্গে সে সময় তিনি যুক্ত ছিলেন না। '৯৮-এর বন্যার পর থেকে তার সওে সম্পর্ক গড়ে ওঠে ডেমরার বর্তমান এমপি সালাউদ্দিনের। 'ধূর্ত' হাশেম সালাউদ্দিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। সালাউদ্দিনও চেষ্টা করেন এ সম্পর্ক ধরে রাখতে। সংসদ নির্বাচনে সালাউদ্দিননের হয়ে ডেমরা থানার নির্বাচনের সম্পূর্ণ দেখাশোনা করে হাশেম। এলাকায় তিনি বলে বেড়ান, নির্বাচনে তার ৩০/৪০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

নির্বাচনে জিতে আসে সালাউদ্দিন। ডেমরার হাশেম হয়ে ওঠেন প্রচন্ড ক্ষমতাশালী একজন। এমপির সঙ্গে তার ওঠাবসা। প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত সবই আসে হাশেমের নিয়ন্ত্রণে। ডেমরা বাসস্ট্যান্ড, বাজার, ঘাট, মাছের খামার সব কিছুর দখলদারিত্ব পেয়ে যায় হাশেম। এসবই হয় এমপি সালাউদ্দিনের 'আশীর্বাদে'। সালাহ উদ্দিনও চায় ডেমরা থানার বিশ্বস্থ একজন। কারণ এই থানায় ঘাট, বাজার, স্ট্যান্ড লাখ লাখ টাকার খনি। এই খনি থেকে টাকা উঠিয়ে আনার জন্য সালাহ উদ্দিন বেছে নেন হাশেমকে। হাশেমও এমপির লক্ষ্য সফল করতে থাকে। জানা যায়, আওয়ামী লীগের সময় হাজীনগর ব্রিজের কাজটি পায় কন্ট্রাক্টর ইসলাম। এমপির নির্দেশে হাশেমকে দিয়ে দেয়া হয় ব্রিজের কাজটি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এমপি সালাউদ্দিনের তাতে লাভ কি? বলা যায়, হাশেমকে দিয়ে সালাউদ্দিন এই কাজগুলো করান। এবং এর থেকে যা আয় হয় তার বড় অংশের ভাগ পান তিনি।

দুই দিন ডেমরা গিয়েও দেখা পাওয়া যায়নি হাশেমের। মোবাইলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দেখা করতে বলা

গ্রামবাসীর পাওয়ার কথা থাকলেও তারা এই ভাগ পায় না। গ্রামবাসীরা জানায় এ তথ্য। কায়েতপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে পড়েছে পূর্বগ্রাম। এই গ্রামের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুজ্জামান খান। তিনি বিএনপি রূপগঞ্জ থানার সহ-সভাপতি। এই ড্রেজিং প্রকল্পের তিনি নেপথ্যে রয়েছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'গ্রামবাসীদের উদ্যোগে নেয়া হয়েছে এ প্রকল্প। এ প্রকল্প থেকে যা আয় হয় তা খরচ হয় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মাঝে।'

কিন্তু প্রকৃত চিত্র সে কথা বলে না। জানা যায়, স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের পকেটে যায় এই অর্থ। স্থানীয় বিএনপি নেতা ফজলুল হক খানের নামে নেয়া হয়েছে ড্রেজিং করার অনুমতি। এছাড়াও এই ড্রেজিং-এ জড়িত আছে পূর্বগ্রাম ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক খান, রূপগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শাহ আলম পাপ্পু। আব্দুল মতিন (ডিলার মতিন), শহীদুল্লাহ মিয়া, আব্দুল কুদ্দুসও ভাগ পায় এই আয়ের। চেয়ারম্যান নূরুজ্জামান খানের রয়েছে বিশাল ক্যাডার বাহিনী। ড্রেজিং প্রকল্পে তারা সব সময় পাহারায় থাকে। শাহ আলম পাপ্পু এই ক্যাডার বাহিনীর নেতা। এলাকায় সে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। নূরুজ্জামান খানের সেকেন্ড ইন কমান্ড। তার এই বাহিনীর মধ্যে রয়েছে ইকবাল, সালাহউদ্দিন, সাঈদ খোকন, মোক্তার হোসেন, পাভেল, রফিক, দিপু ও ওসমান গনি। প্রতিদিন এক এক শিফটে পাহারার জন্য তারা ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পেয়ে থাকে।

স্থানীয় বিএনপি নেতাদের ভাগ দিয়ে বড় একটি ভাগ চলে যায় চেয়ারম্যানের 'বিশেষ ফান্ডে'। এই ফান্ড দিয়ে কি করা হয় প্রশ্ন করা হলে নূরুজ্জামান খান বলেন, 'গরিব, দুস্থ এলাকাবাসীর প্রয়োজনে সাহায্য করা হয় এই ফান্ড থেকে। আল্লাহ আমাকে কম দেয়নি। আমার এখান থেকে টাকা-পয়সার দরকার নেই'। তবে এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা যায়, এই টাকার ভাগ নূরুজ্জামান খান নিজে নেন না। বিএনপি নেতাদের হাতে রাখেন এই টাকা দিয়ে।

এলাকাটি পড়েছে রূপগঞ্জ থানার মধ্যে। ড্রেজিং প্রকল্পের পাশে রূপগঞ্জ থানা একটি ফাঁড়ি বসিয়েছে। আয়ের একটি অংশ তারাও পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ইসলামকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো না। আপনার যা ইচ্ছা লিখে দেন। আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানি না।'

'গরিব, দুস্থ এলাকাবাসীর প্রয়োজনে সাহায্য করা হয় এই ফান্ড থেকে। আল্লাহ আমাকে কম দেয়নি। আমার এখান থেকে টাকা-পয়সার দরকার নেই'

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান খান

চেয়ারম্যান, কায়েতপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ

শীতলক্ষ্যা পাড়ের বিএনপি নেতারা এখন এ ব্যবসা করে চলেছেন। মুড়াপাড়া, রূপগঞ্জ থানার সামনে, দেবই বাজার, কাঞ্চন বাজার, ভেলদী বাজারের সামনে ড্রেজিং প্রকল্প বসানো হয়েছে। হাজার হাজার টাকা আয় করছে এসব নেতা। খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় জানে এ তথ্য। অসাধু কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে অনুমতি পেয়ে যায় নেতারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'এক্ষেত্রে আমাদের করার কিছু নেই। কোনো কোনো ড্রেজিং প্রকল্পে মন্ত্রীর পর্যন্ত রিকমান্ডেশন থাকে।' উল্লেখ্য, রূপগঞ্জ থানার এমপি হচ্ছেন মতিন চৌধুরী। তিনি বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে।

হয় ৭৪ দিলকুশা মতিঝিলে 'দৈনিক দেশ জনতা' পত্রিকা অফিসে। এরপরই ফোন করা হয় এমপি সালাহ উদ্দিনকে। তিনিও একই ঠিকানায় আসতে বলেন। খবর নিয়ে জানা যায়, পত্রিকাটির মালিক সালাউদ্দিন। এমপির সহচর হিসাবে হাশেমকে এই অফিসে পাওয়া যায়। দেশ জনতার অফিসে গিয়ে প্রথমে কথা হয় এমপি সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বালু নদীর ব্রিজের চাঁদাবাজি সম্পর্কে প্রথমে 'অবগত নয়' বলে জানালেও এক পর্যায়ে বলেন, 'বিএনপি'র কেউ এই চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত নয়। দুই পাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা আমার কাছে এসেছিলো। চাঁদা ওঠানোর প্রস্তাব দেয়। আমি বলে দিয়েছি, চাঁদা ওঠাও তবে কোনো ঝামেলা যাতে না হয়।' হাশেমের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'না হাশেম চাঁদা ওঠাবে কেন? আর আমি এর সঙ্গে জড়িত না। আপনি ভুল শুনেছেন। অভিযোগগুলো ঠিক না।' হাশেমের সঙ্গে তার সুসম্পর্কের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ও আমার নির্বাচন করেছে। এভাবেই আমি তাকে চিনি। তেমন কোনো সম্পর্ক হাশেমের সঙ্গে নেই।' এমপি'র সাক্ষাৎকার নিয়ে বের হবার সময় দরজার কাছাকাছি পৌঁছাতেই শুনতে পাই এমপি সালাহ উদ্দিন বেল টিপে ডেকে নিয়েছেন পিয়নকে। হাশেমকে খুঁজছেন। পিয়নকে আস্তে আস্তে কি যেন বললেন।

দেলোয়ারের এই তেলের দোকান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বালু নদীর ব্রিজের চাঁদাবাজি

এমপি সালাহ উদ্দিন ২০০০কে দেয়া সাক্ষাৎকারে হাশেমের পক্ষে কথা বলেন। হাশেমের ক্ষমতার উৎস তিনি একথা অস্বীকার করেন সালাহ উদ্দিন। এমপি সাহেব যখন একথাগুলো বলছেন হাশেম তখন তার অফিসে। এমপির সঙ্গে কথা শেষ

করে বের হবার পর দেশ জনতা অফিসের কর্মচারীদের কাছে হাশেম কোথায় জানতে চাইলে তারা জানায়, এক মিনিট হলো হাশেম বের হয়ে চলে গিয়েছে। মোবাইলে কথা হয় হাশেমের সঙ্গে। তাকে এ চাঁদাবাজি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'এলাকায় উন্নয়ন কমিটি আছে তারা চাঁদা ওঠায়। এলাকার মুরব্বিরা এর সঙ্গে জড়িত। আমি ঐখানে চাঁদাবাজি করি না।' এর পরের দিন হাশেমকে আবার ফোন করা হয়। কথা বলতে চাইলে হাশেম বলেন, 'আপনি এলাকায় গিয়ে দেখেন আমি জড়িত নই। এলাকায় মুরব্বিরা, জব্বার চেয়ারম্যান এই উন্নয়ন কমিটিতে আছে।'

এলাকাবাসী সহ সবাই জানেন এই চাঁদাবাজিকে নিয়ন্ত্রণ করে হাশেম। এ তথ্য হাশেমকে জানালে তিনি বলেন, 'এখন গিয়ে দেখেন আমি আর জড়িত নেই। আপনি এলাকার মুরব্বিদের সঙ্গে কথা বলেন।'

: আপনি বিএনপির কোন পোস্টে আছেন?

: ডেমরা ইউনিয়নের বিএনপি'র যুব পোস্টে আছি।

: এই নামে কোনো পদ আছে নাকি?

: হ্যাঁ, আছে। আমার সঙ্গে কথা না বলে এলাকায় যান, গিয়ে দেখেন এখন আর আমি এ চাঁদা তোলায় নেই।

: এখন নেই কেন?

: ভাই আমি নেই। এখন একবার ডেমরায় যান না।

বালু নদীর ব্রিজের আশপাশে তিনদিন গিয়ে আমরা যে দৃশ্য, যে তথ্য পেয়েছি হাশেম গিয়ে তা দেখার জন্য বলেন। তিনি কয়েকজনের নাম বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এরা সবাই হাশেমের লোক।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে ডেমরায় এই বিশাল চাঁদাবাজিতে পুলিশের ভূমিকা কি? বালু নদীর ব্রিজে যে স্থানে চাঁদাবাজি হচ্ছে স্থানটি রূপগঞ্জ থানায় পড়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু চাঁদাবাজিটা করছে ডেমরা থানা এলাকার বাসিন্দারা। ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নম আবুল হান্নান। ডেমরা থানার ওসির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়।

: শীতলক্ষ্যা নদীতে যে চাঁদাবাজি হচ্ছে এ সম্পর্কে আপনি জানেন কি?

: নদীর পানি তো আমাদের থানার অধীনে নয়। রূপগঞ্জ থানার ভেতর পড়েছে।

: বালু নদীর ব্রিজের নিচে যে চাঁদাবাজি হচ্ছে এটা তো আপনার জানার কথা?

: কোথায়... (টেনে টেনে)।

: ডেমরা ঘাটের বালু নদীর ব্রিজের পাশে।

: কই, আমি তো জানি না? কোথায়... (টেনে টেনে)।

: চাঁদাবাজি হয় যে এর কোনো খবরই আপনার কানে পৌঁছায়নি?

বালু নদীর ব্রিজের নিচে নৌকায় টহলরত চার চাঁদাবাজ

: না, আমি তো শুনিনি।

: তাহলে আপনাকে একটি ঘটনা মনে করিয়ে দেই। মাস খানেক আগে এমপি সালাহ উদ্দিন যখন ত্রিমোহনীতে ত্রান দিতে যাচ্ছিলেন তখন আপনি তার সঙ্গে ছিলেন। যাবার পথে এমপি সাহেব পশ্চিম গাও-এ রূপগঞ্জে কিছু ছেলেকে চাঁদাবাজি করতে দেখে আপনাকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। আপনি তাদের ধাওয়া করেন। এবং পরবর্তীতে তাদের থানায় আটক করেন।

: কোথায়, কবে...।

: পশ্চিম গাঁও এর কাছাকাছি।

: না, আমার মেমোরিতে আসছে না। মেমোরি কাজ করছে না...

: কাজ করছে না, নাকি করাতে চাচ্ছেন না?

: আমি কোনোভাবেই মনে করতে পারছি না।

: ডেমরা নড়াইবাগের হাশেমকে চেনেন...।

: (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) হ্যাঁ, চিনি।

: তিনি কি করেন?

: বিএনপি করেন।

: কাজ কি করেন?

: শুনেছি ব্যবসা আছে। ইট বালু'র ব্যবসা।

: ডেমরা স্ট্রান্ড, বাজার, গাট সব তার দখলে এটা কি জানেন? চাঁদাবাজিরও নিয়ন্ত্রক সে।

: কই, আমি তো জানি না। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখবো।

: এমপি সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন?

: ... (অনেকক্ষণ চিন্তা করে) ভালোই তো দেখেছি। ত্রান বিতরনের দিন এমপি সাহেব তার বাসায় দুপুরের খাবার খেয়েছিল।

: এই ঘটনা মনে করতে পেরেছেন আর পশ্চিম গাঁও এর চাঁদাবাজির কথা মনে করতে পারছেন না?

: নাতো আমার মেমোরিতে এখনও আসছে না।

নষ্টদের দখলে...

দেশের প্রতিটি সেক্টরে প্রতিটি কাজের জন্য দিতে হয় 'চান্দা'। না দিয়ে উপায় কী? যখন চান্দাবাজ হচ্ছেন সাংসদ, পুলিশ ও 'বিশিষ্ট' নেতৃবৃন্দ। চান্দা নেয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে। চাঁদা দিতে গড়িমসি করলে নির্যাতনও চালানো হচ্ছে প্রকাশ্যে। আমাদের আলোকচিত্রী আনোয়ার মজুমদারের ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে এমন দৃশ্য। শুধু অন্ধ তারা, যারা নেবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা, উদ্যোগ। তাদের এই অন্ধত্ব সমৃদ্ধ করছে নিজেদের ভান্ডারকে। এজন্য ঘুচছে না অন্ধত্ব। থাকছে না মেমোরিতে চাঁদবাজের তালিকা।

এই চাঁদাবাজিতে কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? ট্রলার মালিকরা তাদের পরিবহন খরচের জন্য নতুন একটি খাত খুলেছেন। সে হিসেবে তারা লাভের পরিমাণ ঠিক রেখেই বিক্রি করছেন বালু। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে হয়ত আপনি ভাবতে পারেন এখানে আপনার কিছুই যায় আসে না। কেননা চান্দা তো আর আপনার পকেট থেকে যাচ্ছে না। তাহলে আপনি কেন খামোকা মাথা ঘামাবেন। আপাতদৃষ্টিতে এমন ভাবনার যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু এই চান্দার অঙ্ক বাড়ছে প্রতিনিয়ত। কোনো কাজ ছাড়াই একটি শ্রেণী হঠাৎ হয়ে উঠছে বিত্তশালী। এ বিত্ত তাদেরকে করছে আরো ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী। সব কিছুর নিয়ন্ত্রক তারাই হয়ে উঠছে। বাকি সবাই দর্শক। শুধুই দর্শক।

হ্যাভ আর হ্যাড নটের বৈষম্য সব দেশেই থাকে। কিন্তু তার পরিমাপ হয় মেধা আর যোগ্যতার বিচারে। আমাদের দেশে সৎ, মেধাবী আর যোগ্যরা 'হ্যাভ'-এর তালিকায় নাম লেখাতে পারছে না। তালিকাটি দখলে চলে যাচ্ছে নষ্টদের। এই দৃশ্য কোনো সুস্থ দেশের পরিচিতি হতে পারে না।